ISSN: 2708-3225
Fine Arts Journal
Vol. 05, Nov. 2024

বাংলাদেশের নকশি কাঁথায় মোটিফ-এর ব্যবহার
[USE OF MOTIFS IN BANGLADESHI NAKSHI KANTHA]

ড. মো. হাবিবুল্লাহ্*

[**Abstract:** For many years, folk customs and festivals have been inseparably connected to the lives of Bengali people. Similarly, the folk arts and their motifs that have developed around these customs are also deeply rooted in everyday life and rich in meaning. Nakshi Kantha is one of the most prominent examples of this tradition. Every motif in Nakshi Kantha carries some kind of meaning and significance. Although a motif may appear to be just a small part of a design, each one actually bears its own distinct symbolism. In this sense, a motif may be compared to a meaningful word—one that embodies stories from rural life such as love, separation and reunion, joy and sorrow, happiness and suffering, good and evil, desire, fertility, auspiciousness, beauty, and purity. The designs of these life-inspired Nakshi Kanthas are both simple and easily accessible, yet colorful. Within these colors, one finds the joy of life. At a certain stage of fulfilling their basic needs, people turn toward artistic expression, and it is then that such designs emerge. These designs feature various folk customs, animals, birds, flowers, and symbolic representations of vines and leaves. From these, deep beliefs develop, from which religion itself begins to take shape. Be that as it may, just as religion is now a part of life, motifs too have become inseparable from it—an undeniable truth. Together, all these elements form our folk life and folk world, where folk motifs play a special role. In Bangladeshi Nakshi Kantha, the use of folk motifs continues to hold particular significance within this tradition.]

ভূমিকাঃ

বাঙালি লোকজীবনের কথা উঠলেই দৈনন্দিন জীবন জাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন লোকশিল্পের ব্যবহার উঠে আসে। এর মূলে রয়েছে লোকাচার। লোকাচার শব্দটি যেমন লোকদের জীবন সম্পৃক্ত তেমনি ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত। যাপিত জীবনে পালিতি সংস্কার-কুসংস্কারকে তা একটি আনুষ্ঠানিক রূপদান করে থাকে। এসব সংস্কার বা কুসংস্কার মিলেমিলে অনেক সময় জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে ধরাদেয়। তাই আলাদা করে তাকে সনাক্ত করা বেশ দূরহ ব্যপার। লোকাচার পালনেই লোকশিল্পের সূচনা, আবার লোকশিল্প যখন সময়ের ফ্রেমে আবদ্ধ হয় তখন তা কালজয়ী শিল্পে রূপ নেয়। ষড় ঋতুর এদেশে প্রতি দু মাসে ঋতুর পালাবদল হয়। কিন্তু বাঙালি জীবনে

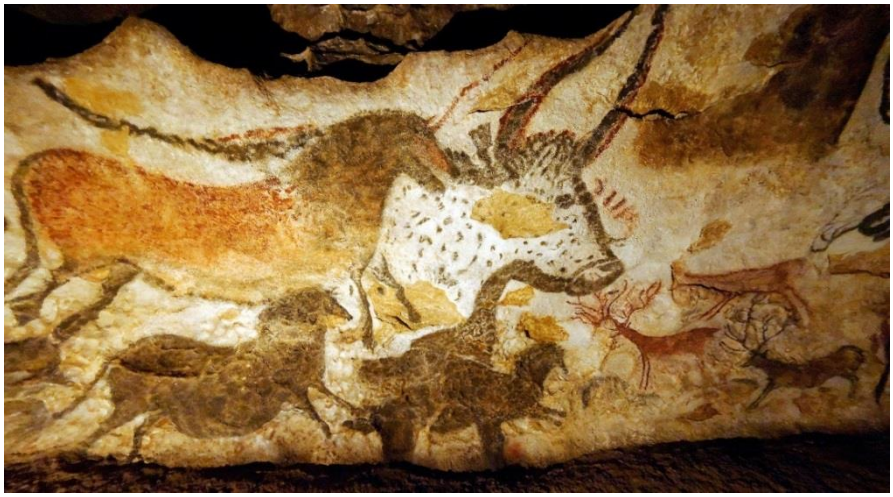
লোকাচার বা লোকউৎসব এতটাই জীবন ঘনিষ্ট যে প্রতি মাসেই কিছু না কিছু লোকাচার লেগেই থাকে এবং প্রত্যেকটি লোকচারের-ই ভিন্ন ভিন্ন নকশা মনোগ্রামরূপে প্রচলিত আছে। নববর্ষ, জামাই ষষ্ঠী, রথযাত্রা, শিব, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, মনসা প্রভৃতি পুজা, জন্মাষ্টমী, ভাইফোঁট, নবান্ন, পৌষ-পার্বণ, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে চৈত্রসংকান্তি কিম্বা মুসলিমদের ঘরে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, শবে বরাত, শবে কদর, শবে মেরাজ, আশুরা, আখেরি চাহা সোম্বা, ফাতেহার ইয়াজদাহম, হিজরী নববর্ষ, মিলাদুন্নবি সহ আরো কত কী-এসকল উৎসবে নকশি কাঁথার বিভিন্ন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের নকশি কাঁথায় মোটিফ বিভিন্ন আঙ্গিকে ও সতন্ত্র তাৎপর্যে ফুটে উঠে। শুধু কী হিন্দু-মুসলিম? বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ আরো নানা জাতি সত্ত্বার বাস এদেশে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীও রয়েছে। তাদেরও রয়েছে নানা উৎসব-অনুষ্ঠান বা পালা-পার্বণ। এসবের মধ্যে কিছু উৎসব আবার সামাজিক যেমন: বিবাহ, জন্মদিন, নবান্ন, পহেলা বৈশাখ বা হালখাতা। জাতীয় উৎসবও রয়েছে- স্বাধিনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষাদিবস প্রভৃতি। তবে অনুষ্ঠানের ধরণ যেমনই হউক তা উপলক্ষ্যে বাঙালি সমাজে প্রত্যেক ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। এ উপলক্ষ্যে বাঙালির ঘরদোর সাজানো যেমন অপরিহার্য তেমনি তার আসনবিন্যাসে লোকশী কাঁথার বিকল্প থাকে না। নকশিকাঁথার সঙ্গে নকশার সম্পর্ক বেশ নিবিড়। এর একটি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে- নকশিকাঁথাকে অর্থবহ করা এর মূল লক্ষ্য। অর্থবহ এ অর্থে যে প্রতিটি নকশি কাঁথায় যেসব মোটিফ থাকে তা এক একটি অর্থবহ শব্দের মত। যে সব শব্দে গঠিত হয় জীবনকাব্য। তেমনি মোটিফও তার নিজেস্ব অর্থ দ্বারা নকশি কাঁথার ন্যায় লোকশিল্পকে অর্থবহ ও জীবনসম্পৃক্ত করে তোলে। প্রশ্ন জাগে মোটিফ কী? কীভাবেই বা এর চল হলো? এক বাক্যে মোটিফকে হয়তো সজ্ঞায়িত কার সম্ভব নয়, তথাপি "নকশা বা আল্পনায় একই আদল বা আকৃতি যখন বারবার ব্যবহৃত হয় তখন তাকে মোটিফ বলে।"[১] যেমন: পদ্ম, কল্কা, চন্দ্র-সূর্য, ফুল, পাখি, মাছ ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে মানব সভ্যতার গোড়ায় যেতে হয়। সেই প্রাগঐতিহাসিক যুগের কথা তখনো মানুষ গৃহ নির্মাণ বা কৃষি কাজ করতে শেখেনি। বন-বাদারে ঘুরে ঘুরে বন্য প্রাণী আর ফলমূল সংগ্রহ করে খেত। প্রকৃতির বৈরি পরিবেশের হাত থেকে অত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের গুহা বা বড় বড় গাছের কোটরে বসবাস করত। কিন্তু মজার বিষয় হলো সেসব গুহার দেয়ালে তারা বিভিন্ন প্রাণীর ছবি মোটিফরূপে আঁকত যা সৃষ্টি করতো একটি অর্থবহ নকশা।

---

* প্রফেসর, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।



চিত্র: আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্র, লাসকো

"এরকম কিছু গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লামু ও লাসকো পর্বতগুহা, ডরডগনসহ আফ্রিকা মহাদেশের আরো কিছু গুহা। এসব গুহাচিত্রের আনুমানিক বয়স খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত।"[২] তবে শুধু ইউরোপ বা আফ্রিকা মহাদেশেই নয় আমাদের উপমহাদেশ তথা ভারতেই এরকম কিছু গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাতে ছবি বা মূর্তি খোদিত রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে হায়দ্রাবাদের অজন্তা ও ইলোরা গুহার কথা উল্লেখ করা যায়। যদিও বয়সের তুলনায় নেহাত নবীন তথাপি এসব গুহায় অঙ্কিত ছবি দেখলে বিস্মিত হতে হয় যা আমাদের উপমহাদেশের নকশাকলার একটি প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কি দক্ষতায় না তারা ছবিরূপে নকশা এঁকেছে, আর রঙের কী ব্যবহার। হাজার হাজার বছর পরেও এতটুকু হেরফের হয়নি। প্রকৃতি থেকে আহরিত রং ব্যবহার করে সেসব চিত্র তারা এঁকেছে। "রং হিসেবে ব্যবহার করেছে নানা রঙের মাটি, পাথর চূর্ণ, ফুল, লতা-পাতার রস সঙ্গে মিশিয়েছে পশুর চর্বি। আর পশুর শক্ত হাড় সুচালো করে তা দিয়ে আঁচড় কেটে রেখা টেনে গুহার দেয়ালে এঁকেছে ছবি। কী কারণেই বা আঁকল এসব ছবি? অনুসন্ধান করে জানা যায় এসব ছবির মূলে ছিলো যাদু বিশ্বাস। জীবিকা নির্বাহে বন্য পশু শিকার ছিলো একমাত্র কাজ। তাই যেসব পশু তারা শিকার করত, তার ছবিই এঁকেছে। আবার পশুর গায়ে তীর, বর্শা এসবও এঁকে দিয়েছে। এর অর্থ হলো, শিকার করার হাতিয়ার দিয়ে পশুটিকে শিকার করা হলো। শিকারে বের হবার আগে এসব ছবি এঁকে শিকারে বের হতো।"[৩] তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, শিকারে আজ সফল হবই। হতও তাই-এ এক যাদু বিশ্বাস। কেননা এ ছবিরূপী নকশার মধ্য দিয়ে একটি ছক বা পরিকল্পনা করা হতো। বিগত দিনের ব্যর্থতার নানা ছক আর পরিকল্পনা তারা এসব নকশা এঁকেই করত। কাজের পূর্বে তার নকশা বা ছক আঁকলে সে কাজে সফল হওয়া যায় এ বিশ্বাস এক সময় যাদু বিশ্বাসে রূপ নেয়

এবং পরে তা ধর্মেও স্থানান্তরিত হয়। ঠিক একই ভাবে নকশি কাঁথায় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের আঙ্গিক তুলে ধরে বিভিন্ন বিগ্রহের মনোতুষ্টের কারণ হিসেবে তুলে ধরা হতো। ফলে নকশি কাঁথা পরিণত হতো এক আধ্যাত্মিক চেতনার ফসল হিসেবে। অপর দিকে প্রিয় মানুষের প্রতি ভালোবাসার বা আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নকশী কাঁথা উপহার হিসেবে দেওয়ার প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে একটি বিশেষ রীতি নীতি। নকশি কাঁথার একটি বিশেষ সুনাম রয়েছে সারা বাংলাদেশে। এই অঞ্চলের নকশি কাঁথার নকশায় যে মোটিফগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা অন্য অঞ্চলের মোটিফের তুলনায় একটু আলাদা এবং বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই অঞ্চলের উৎপাদিত ফসল, ভূপ্রকৃতি, ব্যবহার্য জিনিসপত্র নকশী কাঁথার মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে কোনো শুভ কাজের সূচনা লগ্নে নকশি কাঁথা পবিত্র আসন হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এসব নকশা একসময় সহজি করণে প্রতীকে রূপ নেয়। তাই তো গৃহবাসি গৃহিণী তার নকশি কাঁথায় আঁকে নানা নকশা ও আল্পনা। সেসব আলপনা আর নকশা জুড়ে থাকে নানা মোটিফ। মাছ, পাখি, ফুল, চন্দ্র, সূর্য, পদ্ম, কল্কা এমনকি গৃহ আসবাব পত্র থেকে প্রসাধন সামগ্রি, কৃষি সরঞ্জাম কিম্বা প্রকৃতির নানা উপাদান। "নিছক সৌন্দর্য বর্ধণে নয় বরং তারা বিশ্বাস করে মোটিফের অন্তরালে রয়েছে এক ধরনের শক্তি বা দৈব। যে দৈব বলে তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ হবে।"[৪] বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়, যদি আমরা লক্ষ্য করি সনাতন ধর্মালম্বিদের বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানের দিকে। তাহলে দেখতে পাব বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষ্যে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মোটিফ নকশি কাঁথায় এঁকে থাকে। শুভাশুভর বিচার এসব নকশা আর তার মোটিফের উপর নির্ভর করে বলেই তাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস বলে শুধু নকশি কাঁথায় নয় বরং গৃহের দেয়াল বা মেঝে এবং নিত্য ব্যবহার্য প্রায় সকল বস্তুতেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ বিশ্বাস শুধু সনাতন ধর্মালম্বিদের নয় কম বেশি সকল ধর্মে সকল গোষ্ঠিরর মানুষের মধ্যেই রয়েছে। তাই তো গ্রামের মুসলিম পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও দেখা যায় বিবাহ বা ফসল কাটার অনুষ্ঠানে তারা কলাগাছ বা ডালিম গাছের ছবি এঁকে গৃহসজ্জা করে। কাঁথায় আঁকে ফুল, লতা-পাতার পাশাপাশি, পাখি, মাছ, আয়না, কাকুই, পালকি, নৌকা, পদ্ম প্রভৃতি। পিঁড়ি, শিকা, পাখা থেকে শুরু করে খাবার দাবার পর্যন্ত বাদ পড়ে না।

নকশি কাঁথার মোটিফঃ

কালের বিবর্তনে গুহাচিত্রের মধ্য দিয়ে যে যাত্রা সূচিত হয় তা আধুনিক যুগে লোক আর কারুশিল্পে রূপ নেয়। এখানে ধর্ম অনেকটা নিরপেক্ষ তবে বিশ্বাসের ভিতটি বেশ মজবুদ। একারণে আধুনিক যুগে এসেও তা টিকে রয়েছে। যারা এ যাত্রাটিকে আজ অবধি অব্যহত রেখেছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব গ্রামীণ নারী সমাজের। বংশ পরম্পরা তারা শিখে আসছে এ শিল্পকলা। একজন কিশোরি মেয়ে এসব শৈল্পিক কর্ম শিখে তার দাদি, নানি বা মা-চাচিদের কাছে তারপর তা ছড়িয়ে দেয় তার পরবর্তি প্রজন্মের কাছে। এভাবেই চলে আসছে শিল্পের সতন্ত্র এ ধারা। এখানে সতন্ত্র বলার কারণ আধুনিক শিল্পের জগতে শিল্পীবোদ্ধারা তাদের এ শিল্পকে গ্রামের চাষা-ভূষাদের শিল্প বলে

আক্ষায়িত করেছেন। অথচ তারা বুঝতেও চেষ্টা করেনা যে তথাকথিত তাদের সেই আধুনিক শিল্পের প্রসূতি হচ্ছে চাষা-ভুসাদের সৃষ্ট এ লোকশিল্প। স্বীকৃতিতে কোনো কিছু থেমে থাকেনা, থেমে নেই শিল্পের এ ধারাটিও। যেহেতু অধুনিক শিল্পের মত নিছক সৌন্দর্য বর্ধণ এর মূল বিষয় নয় বরং তা জীবন সম্পৃক্ত এবং বোধ-বিশ্বাসে মণ্ডিত তাই তা দৃঢ় ও প্রবাহ মান। গ্রামের সেসব অধিকাংশ লোকশিল্পীরা এখনো বিশ্বাস করে সূর্য সকল প্রাণ শক্তির উৎস, মাছ, কলাগাছ উর্বরতার প্রতীক। তাদের প্রবল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে শিল্পের এ ধারাটি যেমন টিকে রয়েছে তেমনি লোকশিল্পের এসব মোটিফকে তাদের বিশ্বাসের তাৎপর্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: শক্তি, অপশক্তি, প্রেম, কামনা-বাসনা, উর্বরতা, মঙ্গল, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা। বাংলাদেশর লোক জীবনে প্রচলিত নকশি কাঁথার কিছু মোটিফের তালিকা তুলেধরা হলো:



চিত্র: নকশি কাঁথায় অঙ্কিত বিভিন্ন মোটিফ

প্রকৃতি ও শক্তি কেন্দ্রিক মোটিফ: চন্দ্র, সূর্য, তারা, পাহাড়, নদী, পানির ঢেউ।

বৃক্ষ ও জীবন কেন্দ্রিক মোটিফ: জীবন বৃক্ষ, জীয়ন লতা, ধানের ছরা, পানপাতা, পাকুড় পাতা, পিপুল পাতা, ডালিম গাছ, কলাগাছ, পেয়ারা গাছ, আতাগাছ, আনারস, অশ্বথ বৃক্ষ প্রভৃতি।

পাখি মোটিফ: হংস-মিথুন, সুখপাখি (টিয়া), লক্ষ্মী পেঁচা, ময়ূর, ময়না, মোরগ-মুরগি, কবুতর, বক, ।

প্রাণি মোটিফ: প্রজাপতি, মাছ, কচ্ছপ, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, হরিণ, বানর, গোরু, মহিষ, সজারু, বিড়াল ইত্যাদি।

বাহন মোটিফ: নৌকা, পালকি, গোরুর গাড়ি, উড়জাহাজ।

ধর্মীয় মোটিফঃ তাজমহল, মসজিদ, মন্দির, রথ, নেত্র, পদচিহ্ন, পদ্ম, কল্কা, চরকা বা চাকা, স্বস্তিকা, ঘট, সখের হাঁড়ি, সরাচিত্র ইত্যাদি।

প্রসাধনী মোটিফঃ আয়না, কাঁকুই/ চিরুনী, কানের দুল, নথ, বালা, সুরমাদানী, কাজলদানী প্রভৃতি।

হেসেল ঘরের আসবাবপত্র ও কৃষিজ যন্ত্রপাতিঃ বটি, জাঁতি, খুন্তি, বেড়ি, ওড়ং, হাতা, কলসি, মটকা, তেলের শিশি, শিল-পাটা, হাঁড়ি-পাতিল, কড়াই, ডুঙ্গি, ফুলদানি, হাতপাখা, সিকা, কুলা, ডালা, মাছ ধরার ফলই, হুক্কা, মই, দা, কাস্তে, লাঙ্গল, কোদাল, কুঠার, দাউল, কাকতাড়ুয়া।

বাদ্যযন্ত্রঃ ডুগডুগি, ঢোলক, তবলা, একতারা, সারিন্দা, সানাই।

নিম্নে এমন কিছু মোটিফ নিয়ে আলোচনা করা হলো যা বাংলার লোক জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে চলেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নকশি কাঁথায় ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত মোটিফগুলো।

পদ্মঃ বাঙালির লোকচিত্রকলায় পদ্ম অত্যন্ত জনপ্রিয় মোটিফ।"পদ্ম হচ্ছে ঈশ্বরের আসন, যা সৃষ্টির প্রধান প্রতীক। এর যোগাযোগ রয়েছে বিশুদ্ধতার সাথে এবং সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সাথে। এর সংকোচন ও প্রস্ফুটন একই সাথে জীবনের পুনঃপ্রাপ্ত শক্তিরও প্রতীকযুক্ত। প্রকৃতিগতভাবে যা স্ত্রীবাচক-পদ্ম হচ্ছে তারই প্রতীক। একটি বৃত্তের মধ্যে পুষ্পিত নকশা সর্বদাই এবং সবখানে স্ত্রী অঙ্গের প্রাথমিক ধারণা দেয়, ভারতীয় রীতিতে যাকে 'যোনি' বলে। পদ্ম শেষ অবধি নারী ম্যাজিকেরই প্রতিনিধিত্ব করে।"[৫] পদ্মের অনেক ধরন লক্ষণীয়-আট পাতা বিশিষ্ট বা অষ্টদল থেতে শুরু করে শতপাঁপড়ি বিশিষ্ট শতদল ও শহস্রদল পর্যন্ত রয়েছে। যেহেতু পদ্ম সরাসরি উর্বরতার সাথে যুক্ত তাই এটি অধিক সন্তান-সন্ততি কামনায় নারীরা কাঁথা, আলপনা বা দেয়াল নকশায় ব্যবহার করে থাকে।

কল্কাঃ কল্কা একটি ঐতিহ্যবাহী মোটিফ। তুর্কী শব্দ কল্গা থেকে এর উৎপত্তি যার অর্থ পাতা। ধারণা করা হয় সুদূর পারস্য থেকে ভারতবর্ষে এর আগমন ঘটে এবং মোগল আমল থেকে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিপায়। তবে এর অর্থ পাতা হলেও আমাদের দেশে তা সমৃদ্ধি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যার প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি আলপনায়। "আল্পনায় বহুল ব্যবহৃত মোটিফের মধ্যে কল্কা একটি। কল্কা এখানে লক্ষ্মীর ধনভান্ডারের ধানে ভর্তি প্রতীক চিহ্ন। এই প্রতীক বা রূপক চিহ্ন দিয়ে আল্পনা এঁকে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করলে সংসারে সমৃদ্ধি আসবে, ধানে গোলা পরিপূর্ণ থাকবে। এই বিশ্বাস থেকে এমনটি আঁকা হয়।"[৬] শুধু আলপনায় নয় শাড়ি, নকশি কাঁথায় ও কাশ্মীরী শালেও এ মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রাজশাহীর নকশি কাঁথায় এ মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

শঙ্খঃ শঙ্খ হলো একজাতীয় বড় আকৃতির সামুদ্রিক শামুক। এর খোল দিয়ে অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এটি শাঁখ, শাখ বা কম্বু নামেও পরিচিত।" হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে শঙ্খ ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। হিন্দু সধবা রমণীরা হাতে শঙ্খ দিয়ে তৈরী 'শাখা'

পরিধান করে। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ এবং শুভ কাজের শুরুতে বিশেষভাবে কাঁটা শঙ্খের বাঁশি বাজানো হয়। এ ধর্মে শঙ্খের ধ্বনি পবিত্র বলে ধরা হয়। পূজা আর্চনা, পুত্রসন্তানের জন্ম, অন্নপ্রাশন, শ্মশানযাত্রা ইত্যাদি সময়ে শঙ্খধ্বনি করা হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পঞ্চপান্ডবের ঠোঁটে শঙ্খধ্বনি ধ্বনিত হয়। দেবী দুর্গার হাতেও শঙ্খ দেখা যায়।"[৭] এসব বিবিধ কারনে শঙ্খ পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে মোটিফে স্থান পেয়েছে। নকশিকাঁথা, আল্পনা ও বিভিন্ন নকশায় এ মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

স্বস্তিকা: "এই মোটিফের উৎপত্তি সিন্ধু সভ্যতা থেকে। প্রকৃতিগতভাবে এটি ভারতীয় নকশা এবং প্রায়ই চলমান চাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মহেঞ্জোদারোতে যেসব সিল পাওয়া গেছে তাতে এই নকশার প্রচুর খোদাই দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের কাছ তা সৌভাগ্যের এবং চিরন্তন গতির প্রতীক হিসেবে বিবেচ্য।"[৮] সাধারণত সনাতন ধর্মলম্বিদের ঘরের দেয়ালে স্বস্তিকা আঁকতে দেখা যায়।

নেত্র: নেত্র বা চোখ মোটিফ বাংলার লোক সমাজে বেশ প্রচলিত। বিশেষ করে হিন্দু সমাজে এর প্রচলন বেশি। ত্রি নয়ন যা নেত্র দেবী দূর্গার প্রতীক। তাই তো দেবীর সন্তুষ্টি অর্জনে বা দেবীর নজর কাড়াতে বিভিন্ন স্থানে নেত্র বা চোখ আঁকা হয়। আলপনা, নকশি কাঁথা, হাতপাখা, শস্য রাখার পাত্র প্রভৃতিতে নেত্র মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। মূলত নেত্র মঙ্গল সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাজশাহীর নকশি কাঁথায় এ মোটিফ নকশার উপাদান হিসেবে এসেছে।

লোকজ মোটিফ যেমন নকশি কাঁথায় ব্যবহার করা হয়েছে তেমনি অন্যান্য লোকশিল্পেও লোকজ নকশার ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে তুলনামুলক ভাবে, এখানে মেঝে আলপনার একটা উদাহরণ দেওয়া হলো যা নকশি কাঁথার নকশার সাথে বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।



চিত্র: আল্পনায় অঙ্কিত লক্ষ্মীর পদচিহ্ন

পদচিহ্ন: 'এসো মা লক্ষ্মী বসো মোর ঘরে' লক্ষ্মী পূজোর আরাধনায় এমন প্রার্থনাই থাকে বাঙালির গৃহকোণে। লক্ষ্মী ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী। তাই গৃহে তার পদচিহ্ন পড়ুক এমন প্রত্যশা সকলের। যে চৌকাঠ পেরিয়ে মা লক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করবেন তাতে তাঁর পায়ের প্রতীকী ছাপের আলপনা দেওয়া হয়। ইংরেজি 'এস' অক্ষরের আদলে আঁকা হয় পায়ের ছাপ। এটি একটি মঙ্গল সূচক মোটিফ। সাধারণত সনাতন ধর্মলম্বিরা এর ব্যবহার করে থাকে। নকশি কাঁথায় এ মোটিফের ব্যবহার দেখা যায় অল্প বিস্তার।

জীবন বৃক্ষ: এ মোটিফ একাধারে উর্বরতা, সমৃদ্ধির, সজীবতা, প্রাণধারণের ও আশ্রমের প্রতীক। বৃক্ষ থেকে আমরা যেমন ফুল-ফল পেয়ে থাকি তেমনি বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যকীয় অক্সিজেনও বৃক্ষ থেকেই পাই। আবার এর শাখায় পাখি ও বিভিন্ন প্রাণির বসবাস আর ছায়াতলে মনি-ঋষিদের আশ্রম। "সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে বৃক্ষ মোটিফের ব্যবহার চলে আসছে। সেসময়ের লোকদের কাছে 'পিপুল গাছ' ছিলো পবিত্র গাছ, যা বৌদ্ধদের কাছেও পবিত্র। কারণ এই গাছের তলে বুদ্ধদেব বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। মানুষের কাছে বৃক্ষরাজি সেই প্রাচীনকাল থেকেই উর্বরতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। প্রতিকী আচারে স্ত্রীলোকদের বিয়ে দেয়া হয় বৃক্ষের সাথে। প্রচুর ভারতীয় ভাস্কর্যে আমরা দেখতে পাই বৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যময় যুগলদেহ। স্ত্রীলোকের নাভিমূল থেকে উত্থিত বৃক্ষ প্রকৃতির নারীত্ব ঘোষনা করে।"[৯] সুতরাং উর্বরতার ও জীবনের প্রতীক হিসেবে এ মোটিফটি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। বাংলার লোকাজীবনও বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছে বলে তাদের বিভিন্ন নকশায় মোটিফটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

জীয়নলতা: প্রাচীন মেসোপটেমিয় সভ্যতার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ' গিলগামেশ মহাকাব্য' এই মহাকাব্যে উল্লেখ রয়েছে জীয়নলতার কথা। "উরুকের রাজা গিলগামেশ তাঁর প্রিয় বন্ধু এনকিডুর জীবন রক্ষার্থে মৃত্যুর সাগর পাড়ি দিয়ে 'জীয়ন লতা' আনতে যান। পেয়েও যান সে লতা, কিন্তু শেষ অবধি আর শেষ রক্ষা হয়নি। নিজের ভুলের কারনে সে লতা সাপে গিলে ফেলে। পরিশেষে রাজা বুঝতে পারেন এই পৃথিবীতে কেউ অমর নয়।"[১০] এমনি লোককথা প্রচলিত রয়েছে বাংলার প্রাচীন নগর পুন্ড্রবর্ধনের একটি কূপকে ঘিরে যার নাম জিয়ৎকুন্ড। যার পানি ছিটিয়ে দিলে মৃত দেহ জীবিত হয়ে ওঠে। যদিও এর কোনো সত্যতা নেই। তথাপি অমরত্ব লাভের বাসনা মানুষের চিরন্তর। সুদূর মেসপটেমিয় সভ্যতা যা বহুহাজার বছর আগের কথা, সেই গল্প নিজের অজান্তেই বয়ে বেড়াচ্ছে বাংলার লোকজীবন। বিভিন্ন বস্তুতে বিশেষ করে নকশি কাঁথায়, দেয়াল চিত্রে জীয়ন লতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলার লোকমানস পটেও যে অমরত্ব লাভের বাসনা সুপ্ত রয়েছে তা এ সমস্ত মোটিফ থেকেই বুঝা যায়। আসলে এসব মোটিফের মধ্য লুকিয়ে রয়েছে মানুষের

অনেক অজানা ইতিহাস। সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসতে পারে মানব বংশ ধারার এক অজানা অধ্যায়।

কলা গাছঃ একবীজপত্রী এই উদ্ভিদ গ্রামবাংলার প্রায় প্রতিটি বসতভিটার আনাচে-কানাচে জন্মে থাকে। গ্রামীণ জনসমাজ লক্ষ্য করেছে যে, এই উদ্ভিদ যেমন বিনা যত্নে বেড়ে ওঠে তেমনি ফলবতীও হয়। একসাথে অনেক ফল ধরে। তাদের বিশ্বাস এর সংস্পর্শে আসলে মানুষও উর্বর হবে। তাই তো বিবাহ কেন্দ্রিক বা শুভা-শুভ অনুষ্ঠানে কলাগাছ দিয়ে গেট সাজানো হয়। নতুন ফসল রোপনে জমির মাঝে কলাগাছ গেড়ে (রোপন করে) রাখা হয়। যেহেতু কলাগাছ উর্বরতার প্রতীক তাই একই বিশ্বাস থেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের দেয়াল নকশায় মেয়েরা কলাগাছ এঁকে থাকে। তাদের ধারণা নব দম্পতিও কলাগাছের মত উর্বরা হবে এবং অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম হবে। একটা সময় কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে অধিক সন্তান-সন্ততি বিশেষ করে পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা ছিলো গৃহস্থ কৃষক কুলের। এমনটি লক্ষ্য করা যায় আদিবাসি সমাজেও বরং কিছু ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস আরো প্রকট। তাদের গৃহ কর্মে কলাগাছ বা কলাগাছের মোটিফ অধিক লক্ষ্যনীয়। ফলে নকশি কাঁথায় এ মোটিফের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

ডালিম গাছঃ কলাগাছের মতো গ্রামবাংলার প্রায় প্রতিটি বাড়ির উঠানে দু' একটি ডালিম গাছ দেখতে পাওয়া যায়। "লোক বিশ্বাস মতে ডালিম বেহেস্তের ফল, তাই একে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। বহুদানা বিশিষ্ট স্ফটিকাকার লাল এ ফল পবিত্রতার পাশাপাশি উর্বরতারও প্রতীক।"[১১] গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজে অধিক সন্তান সন্ততির কামনা চিরায়ত। এর পিছনে যৌক্তিকতাও রয়েছে। একসময় যখন জনসংখ্যা কম ছিলো তখন অনাবাদি বা পতিত জমির সংখ্যা ছিলো বেশি। অনাবাদি এসব জমিতে ফলস ফলানোর জন্য কাম্য জনসংখ্যার প্রয়োজন ছিলো। আবার সমাজে নিজেরে প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতেও অধিক সন্তান কামনা করা হতো। একারণে নববিবাহিত দম্পত্তির অধিক সন্তান কামনার্থে বিবাহ অনুষ্ঠানে বা বিয়েবাড়িতে যে সব আলপনা দেওয়া হতো তাতে ডালিম ও ডালিম গাছের ছবি আঁকা হতো। ঠিক একই কারণে নকশি কাঁথায় ডালিম গাছের মোটিফ ব্যবহৃত হয়।

পানপাতাঃ "গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের একপ্রকার লতাজাতীয় গাছের পাতা যা চুন, খয়ের ও সুপারি সহযোগে খাওয়া হয়। আর্য এবং আরবগণ পানকে তাম্বুল নামে অভিহিত করত। নিশ্বাসকে সুরভিত করা এবং ঠোঁট ও জিহবাকে লাল করার জন্য মানুষ পান খায়। তাছাড়া পানের রয়েছে নানা ঔষধি গুন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে পানের ব্যবহার চলে আসছে।"[১২] গ্রামীণ বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠান যেন পান ছাড়া চলেই না। নায়র যেতেও পান সুপাড়ি দেয়ার চল রয়েছে বাংলার লোকসমাজে। আবার পানপাতার আকৃতি হৃদয় চিহ্নের মত হওয়াই তা ভালোবাসারও প্রতীক। দেখতে সুন্দর বলে বাংলার লোকায়ত সমাজ তথা নারীদের

চোখ এড়ায়নি। তাইতো নকশিকাঁথা, হাতপাখা, আলপনা বা দেয়াল নকশায় কিংবা পিঠা-পুলিতে পানপাতা মোটিফ আঁকতে দেখা যায়।

ধানের ছড়াঃ

"শস্য-শ্যামল দেশে, ধানের খেলা সব মাসে,
রোপিয়া ধানের চারা কৃষকের বুক ভরা,
স্বপ্ন আশে জীবন তাদের গড়া।"[১৩]

সুবল চন্দ্র বর্মন এর লেখা 'ধানের ছড়া' কবিতার কয়েকটি চরণ থেকে আমরা একটি রূপকল্প দেখতে পাই তা হলো এদেশের কৃষকদের আশা-আকাঙ্খার একমাত্র কেন্দ্র বিন্দু সোনালি ফসল ধান। যে ধানের সাথে প্রাণ গাঁথা, সেই ধানকে ঘিরে বা ধানের ছড়া কে কেন্দ্র করে লোকজ নকশা আঁকা হবে তাতে বিস্ময় বোধের কিছু নেই। অপর দিকে দেবী লক্ষ্মীকে সন্তুষ্টি করতে নৈবদ্য হিসেবে ধানের ছড়া দেয়া হয়। মূলতঃ তা সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। এসব কারণে লোকজ মোটিফে উঠে এসেছে ধানের ছড়া। রাজশাহী অঞ্চলের নকশি কাঁথায় ধানের ছড়া (ধানের শীষ) মোটিফ আকারে স্থান পেয়েছে কখনও কখনও।

কুলাঃ কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে কুলার ব্যবহার ব্যাপক। প্রায় প্রতিটি ঘরেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ধান-চাল ঝাড়ই বা পরিষ্কার করার কাজে সাধারণত কুলা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পূজা-পার্বণে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও কুলা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাঁশ-বেঁতের তৈরি অর্ধবৃত্তাকার এই কারুপণ্য যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি দেখতেও সুন্দর। তাই লোকশিল্পীরা বিশেষ করে গ্রামীন নারীরা তাদের শৈল্পিক নকশায় মোটিফ হিসেবে কুলা ব্যবহার করে থাকে। নকশি কাঁথা, দেয়াল নকশা, আলপনা প্রভৃতি স্থানে এই মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। নান্দনীকতার দরুন বাংলাদেশের পাঁচ টাকার নোটেও 'কুলা' মোটিফ স্থান পেয়েছে। সৌন্দর্য প্রধান উপলক্ষ্য হলেও 'কুলা' মোটিফের বিশেষ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। "কুলা দেবতাদের অর্ঘ বা নৈবেদ্যর পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্মী দেবীকে কুলা করে ধান-দূর্বা অর্ঘ দেওয়া হয়। ধারণা করা হয় এতে লক্ষ্মী দেবী সন্তষ্ট হয়ে কুলা ভরে শস্য দিবে।"[১৪] এমন বোধ বিশ্বাস থেকে 'কুলা' মোটিফের ব্যবহার রয়েছে।

শিল-পাটাঃ রান্না ঘরের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রি শিল-পাটা। সাধারণত লঙ্কা, মসলা ও ভর্তা বাটার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। গ্রামের প্রায় প্রতিটি গৃহেই শিল-পাটা দেখতে পাওয়া যায়। পাথরের তৈরি এই বিশেষ উপকরণটি দেখতে নান্দনিক বলে তা লোকশিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিভিন্ন মোটিফের মধ্যে শিল-পাটাও স্থান করে নিয়েছে। বলা হয়ে থাকে গৃহবধূ হলো লক্ষ্মী, যার

হাতের স্পর্শ পড়ে এই শিল-পাটায় তাই শিল-পাটা মঙ্গল সূচক অর্থে ব্যবহৃত একটি মোটিফ। এই মোটিফ নকশি কাঁথায় স্থান পায়।

মাছ: মাছের সাথে বাঙালির সম্পর্ক নীবিড়। মাছে ভাতে বাঙালি এমন প্রবাদ একসময় বাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো। শীতল রক্ত বিশিষ্ট এই মেরুদন্ডি প্রাণি তার স্বাদ ও আমিষের চাহিদা পুরনের জন্যই শুধু নয় সৌন্দর্যের কারনেও লোকমানসপটে স্থান করে নেয়। আমাদের আশে পাশের খাল-বিল, হাওর, বাওর ও নদীতে বিভিন্ন প্রজাতি ও রঙের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এর সরল আকৃতি ও সুন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যেমন অনেক লোকশিল্পী মাছকে তাদের নকশায় মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করে তেমনি মাছকে নিয়ে কিছু মিথ প্রচলিত রয়েছে। যেমন: মুসলিম বিশ্বাস মতে বেহেস্তের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা ভুনা (যে মাছ ইউনুস নবীকে খেয়ে ফেলেছিলো)। আবার "ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মাছের পিঠে করেই এদেশে পাড়ি জমিয়েছিল গজনীর সুলতান বলখী মাহিসাওয়ার (রঃ)।"[১৫] বিবিধ কারনে মাছকে যেমন পবিত্র জ্ঞান করা হয় তেমনি বাঙালির লোক সমাজ লক্ষ্য করেছিল মাছ উর্বরতার প্রতিকও বটে। মাছ ডিম থেকে একসাথে অসংখ্য বাচ্চার জন্মদিয়ে থাকে। এসব কারনে বাঙালি সমাজ মাছকে মোটিফ হিসেবে গ্রহণ করে। কোথায় নেই মাছের নকশা: নকশি কাঁথা, দেয়াল নকশা, আলপনা, ওয়ারমেট, এমনকি সখের হাড়িতেও মাছ মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। তবে রাজশাহী অঞ্চলের নকশি কাঁথায় মাছ মোটিফের ব্যবহার ব্যাপক।

পালকি: "পালকি শব্দটি সংস্কৃক 'পাল্যঙ্ক' থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ খাট বা খাটিয়া।"[১৬] এক সময় লোকায়ত বাংলার পরিবহন ছিলো পালকি। সাধারণত জমিদার বা ধনিক শ্রেণির লোকেরা পরিবহন হিসেবে পালকি ব্যবহার করে থাকলেও সাধারণ জনগণ বিশেষ কিছু সময়ে এই পালকি ব্যবহার করত। যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে কিংম্বা নায়র যাত্রায় পালকির বিশেষ চল ছিলো। চাকা বিহীন এই যান মানুষের কাঁধে করে বহন করা হতো। "যারা পালকি বহন করত তাদের বেহারা বলা হত। স্থান বিশেষে এরা হারি, ডুলি বা শিবিকা নামেও পরিচিত ছিলো।"[১৭] বেহারাদের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পালকিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হতো। যথা: দুই বেহারা, চার বেহারা ও আট বেহারার পালকি। জমিদার বা ধনিক শ্রেণির লোকেরা সাধারণত আট বেহারার পালকি ব্যবহার করত। সাধারণ জনগনের জন্য দুই ও চার বেহারার পালকির চল ছিলো। যেহেতু অভিজাত বা ধনিক শ্রেণির লোকেরা পালকি ব্যবহার করত তাই গ্রামীণ কৃষিক পরিবারের বিশেষ স্বপ্ন থাকত অন্তত জীবনে একবার হলেও পালকিতে ওঠা। বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যাকে পালকিতে করে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো তাদের অজন্ম স্বপ্ন ছিলো। একারনে বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মাটির গৃহ নকশায় পালকি মোটিফটি আঁকা হতো। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নকশি কাঁথায় পালকি মোপিফের দর্শন মেলে। এটিও আভিজাত্য ও আশা-আকাঙ্খার প্রতীক।

নৌকা: "নদীমাতৃক বাংলাদেশে এক সময় নৌকাই ছিলো প্রধান বাহন। মানুষ একস্থান থেকে আরেক স্থানে নৌকা যোগে চলাচল ও পণ্য পরিবহন করত। কত রকমের নৌকা ছিলো সেসময়। যথা: ছিপ, ডিঙ্গি, নাও, নায়রী, পানসি, পাতাম, কোষা, কোন্দা, ঘাসি, ইলশা, সাম্পান, সওদাগরী, বাচারি, লম্বা পদি, রপ্তানি, গয়না, বজরা, ময়ূরপঙ্খী"[১৮] আরো কত কী! মাঝি-মাল্লার দল রাত দিন নদীর বুকে রং-বেরঙের পাল তুলে গলা ছেড়ে গান গাইত আর নাও বাইত। ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া সুরে মুখরিত হতো বাংলার আকাশ-মাঠ প্রান্তর। সে দিনগুলি এখন স্বপ্নের সোনালী ফ্রেমে বন্দি। বাংলার এই বিশেষ বাহনও লোকজ নকশায় মোটিফ হিসেবে স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে নকশি কাঁথায় এর ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। নাও বা নৌকা আশা- আকাঙ্খার প্রতীক।

তাজমহল: মোগল সম্রাট শাহজাহানের অমর কৃর্তি 'তাজমহল'। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শণ স্বরূপ ভারতের উত্তর প্রদেশ আগ্রায় যমুনা নদীর তীরবর্তি এ সমাধি সৌধটি নির্মাণ করেন। শুভ্র মার্বেল পাথরে নির্মিত এই সৌধটি এতই দৃষ্টিনন্দন যে তা বিশ্ব সপ্তম আশ্চার্যে স্থান পায়। এ নিয়ে বিভিন্ন কিংবদন্তিও প্রচলিত রয়েছে। "সৌধটির নির্মান শুরু হয়েছিলো ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে যা সম্পূর্ণ হয়েছির ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। বলা হয়ে থাকে ২২ হাজার শ্রমিক ও শিল্পী এর নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করে। ওস্তাদ আহমদ লাহোরি ও ওস্তাদ ঈশা ছিলেন এর নকশাকার বা স্থপতি। ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত বলে এটিকে অনেকটা মসজিদের মত মনে হয়।"[১৯] অষ্টাভুজ আকৃতির এই সৌধকে নিয়ে মানুষের কৌতুহলের কোনো শেষ নেই। যার ঢেউ লাগে বাংলার লোকজীবনেও। তাজমহল নিয়ে নানা কথা, কান কথা থাকলেও বাংলার লোকজীবনে তা প্রেম ও পবিত্রতার প্রতীক। তাইতো বাঙালির বিভিন্ন নকশায় তাজমহল মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে রিক্সা চিত্রে, জায়নামায কাঁথা, নকশি কাঁথা ও রুমালে এর ব্যবহার লক্ষনীয়।

ময়ূর: পাখিসমাজে সবচেয়ে সুন্দর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ময়ূরকে। এর অধিক সৌন্দর্যের দরুন এখন প্রায় বিপন্ন প্রজাতির পাখির মধ্যে গণ্য। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শিল্পীরা একে নানা ভাবে মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করে। তাছাড়া সনাতন ধর্মমতে ময়ূর সৌন্দর্যের দেবতা কার্তিকের বাহন। মুসলিম লোক বিশ্বাসে ময়ূর বেহেস্তের দ্বাররক্ষক, তাই পাখিটিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। অনেকে ময়ূরের পেখমের পালককে বিভিন্ন রোগের শেফা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বিবিধ কারনে ময়ূর মোটিফটি লোকসমাজে জনপ্রিয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির ময়ূর থাকলেও আমাদের দেশে এক সময় নীল ময়ূর বনে জঙ্গলে দেখা মিলত। এখন চিড়িয়াখানা ছাড়া কোথাও এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়না। রাজশাহীর নকশি কাঁথায় ময়ূর মোটিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সুখপাখি: আমরা যে পাখিটিকে টিয়া বা তোতা নামে জানি রূপকথার গল্পে তাই সুখপাখি নামে অভিহিত। সবুজ রঙের চিরসুন্দর এ পাখিটি বাংলার লোকমুখে বিভিন্ন গল্পে শুনতে পাওয়া যায়।

বিশেষ করে ঠাকুরমার ঝুলি ও মৈয়মনসিংহ-গীতিকার অন্যতম নায়িকা কাজলরেখার সাথে এই পাখির সখ্যতা জানা যায়। যে পাখি আনাগত দিনের সুখ-দুঃখের বর্ণনা দিয়ে সাবধান করতে পারে। মোটিফ হিসেবে তাই সুখপাখি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন লোকশিল্পে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন: রুমাল কাঁথা, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, দেয়াল নকশা কিম্বা সখের হাঁড়িতেও এই পাখির ছবি আঁকা হয়। সুখ-সমৃদ্ধির প্রতীক এই সুখপাখি। রাজশাহী রুমাল কাঁথা তথা নকশি কাঁথায় এ মোটিফের অনেক ব্যবহার রয়েছে।

লক্ষ্মী পেঁচা: "হিন্দু ধর্ম অনুসারে পেঁচা হল লক্ষ্মী দেবীর বাহন। লক্ষ্মী পেঁচা দেখতে পাওয়া অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তাদের বিশ্বাস ঘরে পেঁচা দেখলে বুঝতে হবে, মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পড়তে চলেছে সংসারের উপর এবং আর্থিক ভাবে লাভবান হতে চলেছে সে ঘর।"[২০] একারণে তারা আলপনা কিম্বা সরা চিত্রে বা নকশি কাঁথায় লক্ষ্মী পেঁচার ছবি এঁকে থাকে।

হংস-মিথুন: প্রেম ও প্রণয়ের প্রতীক হংস-মিথুন। তাই তো প্রেমিক যুগল বুঝাতে বা প্রেমের প্রণয় ঘটাতে আজো বাংলার রমনীরা এই হংস-মিথুনের ছবি আঁকে। রুমাল কিম্বা সুজনী কাঁথায় বা বিয়ে বাড়িতে দেয়াল নকশায় যুগল হাঁস মুখমুখি হয়ে রয়েছে এমন ছবি আঁকা হয়। হংস-মিথুন নকশি কাঁথার বিশেষ মোটিফ।

হাতি: বাংলার লোক মোটিফে নানা কারণে হাতি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এর বিশাল আকৃতি, শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা, বাহন এবং যুদ্ধে ব্যবহার এসব বহুবিধ কারণে লোকসমাজে হাতিকে আলাদা মর্যদায় দেখা হয়। আবার বৌদ্ধ ধর্মে হাতিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। সেঅর্থে হাতি বিশালত্ব ও শক্তির প্রতিক। সকল অপশক্তিকে দমনে এমন মোটিফ আঁকা হতে পারে। নকশি কাঁথায়ও হাতি মোটিফ ব্যবহার হয়।

হুক্কা: নারিকেলের মালা দিয়ে তৈরি ধূমপানের সরল যন্ত্র বিশেষ। "হুক্কা আরবি শব্দ হুককা থেকে এসেছে, যার অর্থ ধূমপান করা।"[২১] একসময় গ্রামবাংলায় এর ব্যাপক প্রচলন ছিলো। যদিও তা স্বাস্থের জন্য ছিলো খুব ক্ষতিকর তথাপি তামাকে আসক্ত মানুষ তা সেবন করত। হুক্কা আকৃতিগত ভাবে সুন্দর তাই লোক মোটিফে এর স্থান হয়। এটি নিছক ও নিত্য ব্যবহার্য সুন্দর্য বর্ধক মোটিফ, এর বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই।

আয়না-কাঁকুই: প্রসাধনী সামগ্রীর মধ্যে আয়না-কাঁকুই অন্যতম। মেয়েরা তাদের কেশ বিন্যাশ ও সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য আয়না-কাঁকুই ব্যবহার করে থাকে। লোক মোটিফে এর বিশেষ কোনো অর্থ বহন না করলেও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রি বলে তা শিল্পীদের নজর কাড়ে। তবে নকশি কাঁথায় কাঁকুই, মোটিফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপসংহারঃ

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ তার কামনা-বাসনা পূরনার্থে কত কিছু করে আসছে। সেযাত্রায় কখনো বা হার মানতে হয়েছে প্রকৃতির বিপুলা শক্তির কাছে, কখনো বা জীবনের সল্প আয়ুর কাছে কিন্তু মনের ইচ্ছে শক্তি হারায়নি কখনো। মানুষ প্রকৃতির কাছে অসহায় হওয়া সত্বেও থামায় না তার পথচলা। ভবিষ্যত দিনের আশার আলোয় বুক বেধে স্বপ্ন পূরণে ছুটে চলেছে অবিরাম। সে পথচলায় নানা দৈব শক্তির ও ধর্মীয় আশ্রয় নিয়েছে। বিশ্বাসের উপর ভর করে পাড়ি দিয়েছে দীর্ঘ পথ। মনের গহিনে থাকা স্বপ্ন দৃশ্যমান হয়ে ধরা দিয়েছে লোক চিত্রকলায় ও তার মোটিফে। এই ভাবেই মনের সুপ্ত বাসনাকে প্রকাশ ঘটিয়েছে। এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা না থাকা সত্বেও মানুষের মনে পুঞ্জীভূত যে স্বপ্ন বা বিশ্বাস রয়েছে তার শক্তি কে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এসব নিয়েই আমাদের লোকজীবন-লোকভূবন। যার বাস্তব উদাহরণ নকশি কাঁথা। নকশি কাঁথায় লিপিবদ্ধ থাকে বাঙ্গালী নারীর সুখ–দুঃখের রোজনামচা লুকিয়ে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাস।